Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

# লোকসম্পৃক্তির প্রেক্ষণবিন্দুতেঃ জয়া গোয়ালার 'তবু মাদল বাজে' উপন্যাস

# Loksampriktir Prekhonbindute: Jaya Gowalar " Tobu Madol Baje" Uponyash

Binapani Chanda
Teacher of Bengali, Rashtriya Sanskrit Sansthan (D.U.), West Tripura

**Abstract**

This paper discusses about Kothasahitya of Tripura and then moves to present various aspects of the Novel " Tobu Madol Baje", written by Jaya Gowala.

**Keywords**: Jaya Gowala ,Tobu Madol Baje, Tripura, Novel

**Article**

ত্রিপুরার কথাসাহিত্যের অঙ্গন সুবিস্তৃত। ব্রিটিশ ভারতে ত্রিপুরার অবস্থান ছিল দেশীয় রাজ্য রূপে, পরবর্তীকালে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হয় এবং পাঁচ শতকের মানিক্য রাজবংশের অবসান ঘটে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পুনরুত্থান আইন (১৯৭১) অনুসারে ২১শে জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীকালে ভারত রাষ্ট্রের অন্তভূর্ক্ত হয় ত্রিপুরা রাজ্য।

ত্রিপুরা এক সময় ছিল রাজন্য শাসিত রাজ্য। দেশীয় রাজার রাজত্বে স্বাধীন ত্রিপুরায় বাঙালি এবং বাংলা ভাষা পাঁচশ বছর ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গরা বাংলাভাষার যথেষ্ট পৃষ্টপোষকতা করে গেছেন। রাজআমল থেকে ভারতভুক্ত পরবর্তীকালে দেশভাগের বিপর্যয় নেমে আসে এই প্রান্তিক রাজ্যে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ অখণ্ড বাংলা তথা বাঙালি জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। দেশভাগের ফলস্বরূপ পূর্ববঙ্গের অসংখ্য হিন্দু বাঙালি ত্রিপুরা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে কয়েক লক্ষ সর্বস্বান্ত বাঙালি পরিবার ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া ১৯৬২ সালে চিন-ভারত সংগ্রাম, ১৯৬৫ সালে ভারত-পকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে উদ্বাস্তু বাংলাদেশীয়দের ত্রিপুরায় আগমনে শান্ত নিস্তরঙ্গ জনজীবনে ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার রূপান্তর ঘটতে থাকে। সমতলভূমি ছাড়িয়ে জনপ্লাবন ধীরে ধীরে পার্বত্যভূমিতেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলস্বরূপ দীর্ঘ´দিন ধরে বসবাসকারী আদিবাসীদের অবারিত বিচরণ স্থান ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। অন্যাদিকে ছিন্নমূল বাঙালির বেঁচে থাকার এবং মাথা গোঁজার জন্য আশ্রয় নেয় পার্বত ত্রিপুরায়। বাঙালি জনসমাজের নানাবিধ বৈচিত্র্যময় নিজস্ব সংস্কৃতির আদান-প্রদানে সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভবপর হয়েছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ার পাশাপাশি মিশ্র সংস্কৃতি ত্রিপুরার উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে। ক্রমবর্ধ´মান বাঙালিদের আগমনে লোকালয়, জনপদ এমনকি পাহাড় ভূমিতেও

জনসমাগম উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। আর ফলস্বরূপ স্থানাভাব, খাদ্যাভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে ত্রিপুরার জনসমাজকে।

আগরতলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ঘূনা´বর্তে´ আবদ্ধ হতে থাকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় স্বাথা´ন্বেষী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকদের মদতে আদিবাসী ও বাঙালি বিদ্বেষ ঘনীভূত হয় এবং সংঘঠিত হয় আশির ভয়াবহ দাঙ্গা। ১৯৮০ সালে ঘটে যাওয়া এই রক্তাক্ষয়ী দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষের প্রাণঘাতী ঘাটে এবং সামাজিক বিশৃংখলতার সৃষ্টি হয়। সমাসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার দিকে উঁকি দিয়ে ত্রিপুরার কথাসাহিত্যিকেরা সেই জাজ্বল্যমান সময়কে স্থায়িত্ব দিয়েছেন কথাসাহিত্যের মাধ্যমে। তাই ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার উপন্যাসের আদল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেখানে স্থান পেয়েছে ছোট জনপদে বসবাসকারী মানুষদের জীবনের নানা ঘটনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিজস্ব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য কলহ বিবাদের কাহিনি, আত্মত্যাগ, অন্যায়ের প্রাতিবাদের সুদৃঢ় উচ্চারণ, তার পাশাপাশি আস্তিত্বের টানাপোড়েন, আধুনিক জীবন যন্ত্রণা ও মনস্তাত্বিক জটিলতা। বাঙালি- উপজাতি-মনিপুরি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, জয়-পরাজয় বেঁচে থাকার নিরন্তর যুদ্ধ ত্রিপুরার সাহিত্যে তথা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রেরণা। তাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে আঞ্চলিক ভাষা, আচার-আচরণ ধীরে ধীরে লোকবলয়কে সমৃদ্ধ করেছে। জাতি-উপাজাতি ও ত্রিপুরার বাংলাসাহিত্যের জগত কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে ভরপুর। কিন্তু কবিতা ও ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যা অপ্রত্যুল। অখ্যাত জনবসতিপূর্ণ লোকসমাজের সামাজিক রীতিনীতি আচার-আচরণ, বিবিধ অনুষ্ঠান তথা লোকসমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, লোকানুষ্ঠান তথা লোকসামাজ সম্পৃক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবিও অনুল্লেখিত থাকেনি।

ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে জয়া গোয়ালা অনন্যা। শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক রূপে জয়া গোয়ালা সর্বজন পরিচিত একক ব্যক্তিত্ব। নিম্নবর্গে´র ত্রিপুরায় বসাবাসকারী মানুষজন তাঁর সৃষ্ট জগতের কাণ্ডারী। শ্রমিক-মজুরদের জীবনযাপন এবং তাদের দুঃখ-সুখাশ্রয়ী জীবনের মম´ন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় উপজীব্য। জয়া গোয়ালার 'তবু মাদল বাজে' উপন্যাসটির শুরুতেই যাদু বিষয়ক সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। ডমরুর স্ত্রী ফুলিকে ভূতে ধরেছে এবং ভূতকে তাড়াতে তারা গঙ্গাবুড়ির দ্বারস্থ হয়। এই বুড়ি মন্ত্র-তন্ত্র জানে, জলপড়া, তাবিজ-কবচ দেয়। এক ওঝা বাবার ভয়ংকর চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা এভাবে---

" জবা ফুল চোখ, কালো পাথর—কুঁদো বট- গুঁড়ি শরীর, পিঠে ইয়া কুঁজ। বাবরি চুলে কাঠ কাঁকই, পিঠের লাল শালুর বোঁচকা যেন আরেকটা কুঁজ। হাতের লাঠিটাতো আরও ভয়ংকর, মাথায় একটা সাদা হাড় লটকানো।"১

গোবর-লেপা দাওয়ায় হালদিমাখা আলোচাল দিয়ে 'দিশা' করে ওঝা, নানাবিধ আচার সম্পন্ন করে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে অবশেষে জানায় যে,--

"ধরেছে ঐ শ্মশানেরটা-। দূরে উত্তরের ঢালটা অর্থ্যাৎ শ্মশানখলাটা দেখিয়ে ওঝা বলে। বুঝলি ডমরু, বৌ-কে খাপমতন ধরে নিয়েছে শয়তানটা।"২

মুরগি, সোয়া কেজি চাল, ল্যাংগি-মদ, হাঁসের বাচ্চা ইত্যাদি উপাচারে পূজা দেবার মানত করা হয় রোগ আরোগ্যের শর্তে। ডমরু ফুলির দাম্পত্য জীবনে দুটো পুত্রসন্তান এবং ফুলি আসন্না সন্তানসম্ভাবাও। টিলার উপর থেকে অসাবধানতাবসত পড়ে গিয়ে তাঁর রক্তক্ষরণ ঘটে, কিছু সুযোগসন্ধানী ওঝা একে ভূতে ধরেছে এই অপবাদ চালিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে ফুলি মৃত্যুর কোলে পতিত হয়। গ্রামের উত্তর দিকের শ্মশানে কবর দেওয়া হয় লোকসমাজের বিশ্বাসানুযায়ী। লেখিকা লিখেছেন—

" সেই কবে থেকে তিন টাঙার এই টিলা গাঁয়ের মানুষগুলো এখানেই কবর খুঁড়ছে। প্রিয়জনকে মাটি চাপা দিয়ে মাথা খুঁটছে। প্রত্যেকে এক মুঠো মাটি দিয়ে শেষ সোহাগ, তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।"৩

সামাজিক বহুবিধ আচার অবশ্যই পালনীয়, জীবনের সঙ্গে তার অন্বয়ও সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক এবং কিছু আচার মান্যতা দেওয়া হয় সামাজে, যাকে বলা হয় লোকাচার। এখানে ফুলির মৃত্যুজনিত আদ্যশ্রাদ্ধ এবং শ্রদ্ধা জানানো, রূপোর টাকা, বাসন-কোসন, গয়না-গাঁটি সহ কবরের ভেতরে জ্যান্ত মুরগি দেওয়া হয়, লোকসমাজের কাছে এগুলি লোকাচার স্বরূপ। দুঃখ-সুখ, কষ্ট-খুশি, হতাশা-আশা সবকিছু প্রকৃতির নিয়মে পারিবর্তনশীল। সেরূপ সময় ও পরিস্থিতির আবর্তে তিনটাঙার জনসাধারণ এগিয়ে যায় আগামীর দিকে--

" তবে এরাও হাসে, কাঁদে। শাদি-বিহা পুজো-পালিতে 'দনা' ভরা হাঁড়িয়া-র মহুয়া নেশায় এরা নাচে। 'দনা' তৈরি করে মেয়েরা পাতা দিয়ে। একজাতের ঝাড়ু শলা বা অন্য কোনও সরু কাঠি দিয়ে পাতা গেঁথে গেঁথে বানানো হয় চমৎকার গোল গোল পানীয় পাত্র। শিকড়-বাকড় আর পচা ভাতের তৈরি হাঁড়িয়া এই 'দনা' দিয়ে গেলে এরা। গেলে আর হেলে দুলে নাচে। মাদালের বোলে বোলে, ঝুমুরের ছন্দে ছন্দে, জীবন সঙ্গীতে, মদের পিয়াসী ঠোঁটে আকাংখার হাজারো ফুল ফোটে। ফোটে, তারায় ঝরেও যায়। মনের কোণেও সংগোপন অভিনয়ে লুকোনো পুষ্প-বীথিকা নজরেই পড়ে না কারোর। ক্ষয়া ক্ষয়া জীবনে বিবর্ণ অনুভূতি। অনুভবের সীমানা

মাড়িয়ে খুব অল্পক্ষণই স্থায়িত্ব পায়। তাই বিশেষ কোনও ঘটনা নিস্তরঙ্গ হৃদয় দরজা ঠেলে আলোড়ণ তো জাগায়, কিন্তু সে আলোড়ণ তোলপাড় থিতিয়ে যায় পলকেই। নোনা ঘামের কী জবরদস্ত খেল।"৪

তার পাশাপাশি পাহাড়ের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনচিত্র, অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রাম সবকিছুই বাস্তবের মাটি থেকে ওঠে এসেছে। মহুয়া গাছের শুকনো ফুল থেকে জাত মাদক পানীয় সীমান্ত বাংলার পাশাপাশি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরায়ও সমান জনপ্রিয় পানীয়, লোকউৎসবে ও পুজো-পার্বণে এ সকল পানীয়ের চলন রয়েছে। আবার শিকড়-বাকড় আর পচা ভাতের সহযোগিতায় তৈরি হাঁড়িয়া তাদের কাছে জনপ্রিয় লোকখাদ্য। এই সকল খাদ্য

সাধারণভাবে অথবা বিশেষ বিশেষ দিনে আমোদ-প্রমোদের সময় এই খাদ্য গ্রহণ করে লোকসমাজ। তাছাড়া মাদলের বোল, ঝুমুরের নৃত্য—লোকবাদ্যযন্ত্র এবং লোকনৃত্যের উৎকৃষ্ট নিদশ´ন।

মৃত্যুর পর আত্মার মুক্তির কামনায় শ্রাদ্ধ এবং তৎসলগ্ন নানা আচরণাদিও সাঁওতাল মাঝিদের ও ডমরু সামাজে লক্ষ্য করা যায়। ডমরুদের মহাজন নরহরি দেববর্মার কাছে থেকে নিরুপায় ডমরু তাঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধের জন্য টাকা আনতে বাধ্য হয়। 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' ডমরুদের মতো তিনটাঙা গ্রামের অন্যান্য মানুষদেরও দুঃখ-কষ্টাশ্রয়ী অনাহার জীবন তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তাঁর পাশাপাশি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ওঠে আসা লোকসঙ্গীত তাদের প্রাণের সম্পদ। এমনই একটি লোকসঙ্গীত সাঁওতালী গান আর ঝুমুরের কলি—

"বাঁশ কা বুদাতারে কে মারে সিটি
ছটোকে দেওয়ার নান্দালাল মারে সিটি,
লাজইর,-- ছোটোকে দেওয়ার নান্দালাল মারে সিটি,
..... ধীরে, গো ধীরে, হায়রে গো ভালা
ছোটোকে.....।"৫

গহীন অরণ্য-জঙ্গলে টিলার গাঁয়ে যারা বেঁচে আছে, তারা জীবনের দ্বীপকে টিকিয়ে রেখেছে। কেননা তাকে বেঁচে থাকা বলা যায় না। তিনটাঙ্গার মানুষদের এই সংগ্রাম জীবনকে টিকিয়ে রাখারই নামান্তর। মাঝি, ওরাং, সাঁওতাল, মুণ্ডা ও আদিবাসীদের সাম্মিলিত ও সুসংবদ্ধ বাসভূমি আবাসস্থল তিনটাঙ্গার গ্রাম।

জনশ্রুতি আছে যে, অনেক আগে এক গাছের ডালে তিনজন মানুষেরা আত্মহত্যা করেছিল। আর একারণেই এই জায়গাটাকে লোকসামাজ তিনটাঙ্গা নামে চিহ্নিত করেছে। লেখিকা লিখেছেন---

" সেই থেকেই গাঁ-টা তিনটাঙা। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই তাই জানে। বড়ো সরল এই মানুষগুলো, অরন্যের মতোই, তাইতো নামেও কোনও ঘুরপ্যাঁচ নেই। নেই কোনও জটিলতা।৬

ওরাং, মাঝি, মুণ্ডা ও আদিবাসী অংশের মানুষগুলোর বিবাহ, পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ, অনুস্ঠান, লোকখাদ্য এমনকি ব্যবহারিক পোষাকেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যিক জয়া গোয়ালা সহজ, সরল, কাব্যময় ভাষায় আদিবাসী কন্যা কসমতীর বর্ণনা দিয়েছেন। পাঠকেরাও যেন নিজচক্ষে অবলোকন করেন সেই দৃশ্য, যেখানে মহাজনের গাঁয়ে যাওয়ার পথে 'রিশা' ও 'পাছড়া' পরিহিতা কসমতীর 'জংলী হলুদ ফুলের হাসি'। প্রসঙ্গত 'রিশা' আদিবাসী রমণীদের বুক বাঁধা কাপড়ের অংশবিশেষ এবং সাদা-লালের পাছড়া আদিবাসীদের নিজস্ব ব্যবহারিক পোষাক। তার পাশাপাশি উপজাতি মহিলাদের প্রাত্যহিক যাবতীয় জিনিসপত্র মাথায় বহন করার মাধ্যম 'লাঙ্গা'। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মাধ্যে খাদ্যের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকখাদ্য যথাক্রমে- চাল, সিদল, গোদক ও শুয়োরের ভতা´।

অন্যদিকে মুণ্ডা জনজাতির শিশুদের জন্য উপাদেয় খাদ্য চালের গুঁড়ো বেঁটে সিদ্ধ করে খাওয়ানো এবং ছাগলের দুধ। মানুষের দুঃখ–কষ্ট, হাসি-আনন্দের লোকনৃত্য গভীরভাবে সম্পর্কি´ত। বাসন্তির রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায় ডমরুর মনকেও। তাঁর সেই আনন্দরেই বহিঃপ্রকাশ ঝুমুরের নৃত্য—

" নিদাশিঙ্গি সুপিরে গম সাবিনা
নামদো মাইরে বেজান বগিয়া।"৭

আপন মনের খেয়াল খুশিতে ডমরু গুণগুণিয়ে ওঠে লোকসঙ্গীতের আবেশে-- --

"নামদো মাইরে বেজান বগিয়া
আঙ্গে আনা সেতায়ানা
সুপিরে গম সাবেয়ানা নিদাশিঙ্গি।"৮

লোকসমাজ বিশ্বাস করে যে, রাত্রিতে সাপ বলতে নেই, বলতে হয় লতা। যেমান অরাল পাখি ডাকা অমঙ্গলের, অশুভতার দ্যোতক। তাই লোহা পুড়িয়ে পাখিটাকে তাড়ানো হয়ে থাকে শুভমঙ্গলের আশায়। মুণ্ডাদের লোকবাদ্যযন্ত্র- মাদল আর ধামসা। ধামসা আর মাদলের বোল উপন্যাসেও অনুল্লেখিত থাকে নি- 'ঢিঢিগঢিচা ও ঢিঢিগঢিচা'। 'দোল-পূর্ণিমা'-য় ডমরুর দুই ছেলে সুনু ও মুনু বাঁশের পিচকিরি দিয়ে রঙ খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। কাঁচা হলুদ বেটে চুন গুলে চমৎকার রঙ তৈরি করা হয়।

প্রবাদ-প্রবচন মানব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দীর্ঘদিনের আভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ততম বাক্যে প্রকাশ করাই প্রবাদের বৈশিষ্ট্য। লেখিকা এখানেও প্রবাদকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'তবু মাদাল বাজে' উপন্যাসে ফাগুলালকে দেখে ডমরুর মনে হয়েছে—' ডিগা কাঠালটা পাকে গেছে আগেভাগেই।' তেমনি চিন্তামুক্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ আর এখানেই ওঠে এসেছে প্রাবাদ—'ধীর পানি পাথর কাটে।'

উপনাস্যের বিবিধ জনগোষ্ঠী মানুষের লোকভাষাও ওঠে এসেছে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে। মুণ্ডাদের মুখের ভাষা- 'রঙ্গ নাই, চল-এই দেখ দুপহর বাজে গেছে', কিংবা 'পরথম হামিও ভাবেছিলম। কী মারটাই না দিল অয়ার ছাতিয়ে।' আবার ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষা ককবরক ভাষাও এখানে স্থান পেয়েছে—'হেই, নিনি মুঙ তাম?' বাংলায় ভাষান্তর হবে- 'ওহে তোমার নাম কী?'

প্রান্তিক জীবনের কাহিনিকার জয়া গোয়ালা খুব সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দে প্রেক্ষিত অনুযায়ী সাবলীন। বলাবাহুল্য যে, তাঁর লেখার বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের জীবনবোধ, সুখ-দুঃখ, আসা-নিরাশার সঙ্গম লোকভাষার মিশেলই তাঁর উপন্যাসের আবহ তৈরি করেছেন তিনি। তাঁর লেখনিতে রয়েছে একটা টানটান উত্তেজনা,- যে পাঠক একবার পড়তে শুরু করবেন, তিনি শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছাড়তে পারবেন না। ত্রিপুরার বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন—

"কিন্তু তুলনামূলক ছোট পরিসরে লেখা জয়া গোয়ালার উপন্যাসগুলিকে ত্রিপুরার উপন্যাসের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দিতেই হয়। হতদরিদ্র আদিবাসী মানুষ ও ওপার বাংলা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে আসা গরীব বাঙালির ছাড়াও ত্রিপুরার বিভিন্ন চা বাগানের ও গোয়ালবস্তিতে যে অবাঙালি শ্রমিকেরা বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে থাকতে থাকতে এখানকারই মানুষ হয়ে পড়েছেন, তাদেরই মেয়ে জয়া গোয়ালা।"**৯** আলোচকের উক্ত মন্তব্যটি যথাযথ ও প্রণিধানযোগ্য।।

**উল্লেখপঞ্জি**

১) জয়া গোয়ালা, 'অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ', ('তবু মাদল বাজে') অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০০৩, কোলকাতা বইমেলা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭৫।

২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৫।

৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৬।

৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৭ ।

৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮১-৮২।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬।

৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০২।

৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০২ ।

৯) শ্যামল ভট্টাচায´, 'পাঠ প্রতিক্রিয়া, উত্তর পূবা´ঞ্চল পর্ব'(প্রথম খণ্ড) ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ-আগরতলা বইমেলা- ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪২।

**গ্রন্থপঞ্জি**

১) গোয়ালা জয়া, 'অন্য মানুষ ভিন্ন রঙ', অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০০৩, কোলকাতা বইমেলা।

২) রায়বর্ধন অশোকানন্দ, 'ত্রিপুরার লোকসমাজ ও সংস্কৃতি', ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০০২।

৩) ভট্টাচায´ শ্যামল , 'পাঠ প্রতিক্রিয়া, উত্তর পূবা´ঞ্চল পর্ব'(প্রথম খণ্ড) ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ-আগরতলা বইমেলা- ২০১৩।